যক্ষ্মার ঝুঁকি কাদের বেশি, কী করবেন

আমাদের দেশে যক্ষ্মা এখনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। এতে শুধু গরিব লোকজনই যে আক্রান্ত হচ্ছে, তা নয়- বরং এ রোগ যে কারোরই হতে পারে। যক্ষ্মার ঝুকি কাদের বেশি, প্রতিকার পাওয়ার উপায় কী এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।

কারা বেশি ঝুঁকিতে আছেন যক্ষ্মা রোগীর কাছাকাছি থাকেন- এমন লোকজন, যেমন: পরিবারের সদস্য, ডাক্তার, নার্স বা সেবা- শুশ্রূষাকারীর আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। ধূমপান, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, মাদকাসক্তি, বার্ধক্য, অপুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যক্ষ্মার ঝুঁকি থাকে। আবার যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, যেমন: এইডস রোগী, দীর্ঘ মেয়াদে স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধসেবী লোকজনের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

যক্ষ্মা কেবল ফুসফুসে হয় না ৮৫ শতাংশ যক্ষ্মা ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। তবে ফুসফুসের আবরণী, লসিকাগ্রন্থি, মস্তিষ্কের আবরণী, অন্ত্র, হাড়, ত্বক ইত্যাদিতেও যক্ষ্মা হতে পারে। তবে হৃৎপিণ্ড, নখ ও চুল এ রোগের আওতামুক্ত।

জীবাণু প্রবেশ করলেই যক্ষ্মা হয় না। শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা যক্ষ্মার জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে। এ জীবাণু সাধারণত কাশির মাধ্যমেই ছড়ায়। অনেক সময় যক্ষ্মা সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং পরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে প্রকাশ পেতে পারে। আবার অনেক সময় যক্ষ্মার জীবাণু দ্রুত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় ও জটিল আকার নেয়।

কখন সতর্ক হবেন তিন সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাশি, জ্বর, অরুচি, কাশির সঙ্গে রক্ত যেতেও পারে নাও যেতে পারে, ওজন হ্রাস, অবসাদ ইত্যাদি দেখা দিলে অবশ্যই যক্ষ্মা পরীক্ষা করা উচিত। এর বাইরে দীর্ঘক্ষণ ধরে লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি, মলত্যাগের অভ্যাসে আকস্মিক পরিবর্তন, কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য কখনও ডায়রিয়া, বুকে বা পেটে পানি জমা ইত্যাদিও উপসর্গ হিসেবে বিবেচ্য।

যক্ষ্মা নিয়ে ভয় নেই যক্ষ্মা হলেও আতঙ্কিত হবেন না। এ রোগের সুচিকিৎসা আছে। তবে পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবন করতে হবে। দু’ধরনের ক্যাটাগরিতে ওষুধ দেয়া হয়, ছয় মাস ও আট মাসের মেয়াদে। ওষুধ অনিয়মিত খেলে পরবর্তী সময়ে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা হতে পারে, যা সারানো খুব জটিল। সারা দেশে ডটস সেন্টারে বিনা মূল্যে যক্ষ্মার ওষুধ দেয়া হয়। তাই রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শীতে চুল পড়া বাড়লে কী করবেন

শীত এলেই চুল শুষ্ক হয়ে যাওয়া, খুশকির মতো সমস্যা বাড়তে থাকে। উৎসবের মৌসুমটাতে তাই চুল নিয়ে সবারই বাড়তি চিন্তা করতে হয়। মসৃণ ও ঝলমলে চুল রাখতে চাইলে শীতে কিছু বিষয় এড়িয়ে চলুন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার এ সময়টাতে চুল সুন্দর রাখতে কী কী করবেন না, জেনে নিন।

শীত এলেই কমবেশি সবাই গরম পানি দিয়ে গোসল করে থাকেন। সারা বছর গরম পানিতে গোসল করার অভ্যাস অনেকেরই থাকে না। গোসল করেন ঠিক আছে কিন্তু অতিরিক্ত গরম পানিতে মাথা না ধোয়াই ভাল। তাতে রুক্ষ হয়ে যেতে পারে চুল। কারণ গরম পানি চুল থেকে তেল শুষে নেয়। তাতেই চলে যায় চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য।

শীতকালে শ্যাম্পু করেই হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানোর অভ্যাস থাকলে আজই সেটা বাদ দিন। নিয়মিত চুলে তাপ দিলে তা রুক্ষ তো হয়েই যায়, সঙ্গে বাড়তে পারে চুল পড়ার সমস্যা। চুলের ডগা ফেটে যেতে পারে। তালু শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। খুশকির সমস্যাও বাড়তে পারে। ব্যস্ততার জন্য গোসলের পর পরই ভেজা চুলে অনেককেই বের হতে হয়। এটিও ডেকে আনতে পারে নানান সমস্যা। ভেজা চুলে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে চুল শুকাতে চায় না। পানি বসে যেতে পারে মাথায়। তাতে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি তো হতেই পারে, সঙ্গে খারাপ হয়ে যেতে পারে চুলের অবস্থাও। দিনের পর দিন এভাবে চুলে পানি থাকলে আপনার চুল কিন্তু পড়তে শুরু করবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

* [redacted]

* [redacted]

[redacted]

পারে। গরম প্যাক ফোলা জায়গায় রক্ত জমা হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এভাবে ফোলা কমিয়ে দেয়। গরম ও ঠাণ্ডা প্যাক উপকারি শুধু যখন কোনো আঘাতের কারণে ঠোঁট ফুলে যায়।

চা পাতার ব্যাগ: ফোলা ঠোঁটে চা পাতার ব্যাগের প্রয়োগ আরেক কার্যকর উপশম পদ্ধতি। একটি টি ব্যাগ বা চা পাতার ব্যাগ কয়েক মিনিট গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর চা পাতার ব্যাগকে বের করে ঠাণ্ডা করতে হবে। ঠাণ্ডা হওয়ার পর চা পাতার ব্যাগ ফুলা ঠোঁটের ওপর কয়েক মিনিট ধরে রাখতে হবে। এ পদ্ধতি ঠোঁট ফোলা কমতে সাহায্য করে থাকে।

মেডিকেটেড মলম ঠোঁটের ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে শুষ্কাবস্থা অবসানের জন্য। কারণ ঠোঁট ফুলে গেলে স্থানটি শুষ্ক হয়ে যায়। হারপিস ভাইরাসজনিত কারণে ঠোঁট ফুলে গেলে অবশ্যই অ্যাসাইক্লোভির গোত্রভুক্ত ওষুধ সঠিক নিয়মে নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবন করতে হবে। এলার্জিজনিত কারণে ঠোঁট ফুলে গেলে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে কর্টিকোস্টেরয়েড প্রয়োগ করা যেতে পারে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়। কোনো কোনো সময় স্থানীয়ভাবে প্রয়োগকারী মলম ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবাণুযুক্ত কোনো ফুলা থাকলে এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন হতে পারে। রোগীরা বাসায় বসে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে পাঁচ দিনের মধ্যে যদি ঠোঁট ভালো না হয় তবে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। তাই সবচেয়ে ভালো হয় ঠোঁট ফুলে গেলে কালবিলম্ব না করে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ঠোঁট শরীরের সংবেদনশীল অংশ যা মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ঠোঁটে কোনো সোয়েট গ্ল্যান্ড থাকে না। সোয়েট গ্ল্যান্ড ত্বককে তৈলাক্ত রাখে এবং পুষ্টি জোগায়। ঠোঁটে এই গ্ল্যান্ড থাকে না বলে ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায়। ঠোঁটের রোগ ছাড়া ও ঠোঁটের ও মুখের স্বাভাবিক যত্ন নিতে হবে।

যে চায়ের কেজি লাখ টাকা

চা ছাড়া অনেকের দিন চলেই না। চা নিয়ে গবেষণা আর কাব্য তো কম হয়নি। কিছু চা যত পুরোনো হয়, তত স্বাদ বাড়ে। কিছু চা বছরের কেবল একটি নির্দিষ্ট দিনেই সংগ্রহ করতে হয়। আর কিছু চা সোনায় মোড়ানো। শোনা যাক, এমনই কিছু চায়ের আজব গল্প।
মোঙ্গল সাম্রাজ্যের এক রাজার মায়ের ভয়াবহ অসুখ। কোনো পথ্যতেই অসুখ সারে না। সব চিকিৎসাই যখন ব্যর্থ, এমন সময় উয়ি পাহাড়ের চূড়ায় এক ঝোপে পাওয়া গেল দা হং পাও পাতার খোঁজ। এটা আসলে বিশেষ ধরনের চা। এই চা পান করেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন রাজার মা।

সেই থেকে এখনো দা হং পাও বিশ্বের সবচেয়ে দামি চা। সোনার চেয়েও অন্তত ৩০ গুণ দামি। বিশ্বের বাজারে এই চাকেই সবচেয়ে দামি চায়ের মর্যাদায় রাখতে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও খুব অল্প পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। অবশ্য এই চা উৎপাদনও সহজ কথা নয়। কেননা এই চায়ের আসল স্বাদ পেতে হলে চা–গাছের বয়স হতে হবে অন্তত ৩০০ বছর। এখন অবশ্য উয়ি সম্প্রদায় এই চায়ের গাছ লাগিয়েছে। তবে সেই চায়ের স্বাদ আসলটার কাছাকাছিও নয়। গাছগুলো যত পুরোনো হবে, ততই স্বাদ বাড়বে। দা হং পাও অর্থ লাল রঙের গাউন। টকটকে লাল রঙের এই চা পান করার পর দীর্ঘক্ষণ মুখে লেগে থাকে ফুলের সুবাস।

পিজি টিপস নামটি অনেকের কাছেই পরিচিত। এটা একটা ব্রিটিশ চায়ের কোম্পানি। ৯১ বছর বয়সী এই কোম্পানিটি বিখ্যাত বাজারে ডায়মন্ডের টি-ব্যাগ আনার জন্য। চায়ের কাপে ডায়মন্ডের টি ব্যাগ ভিজিয়ে খেতে প্যাকেটপ্রতি খরচ পড়বে ১২ লাখ টাকা। পিজি টিপসের চা বিরল প্রজাতির সিলভার টিপস ইম্পোরিয়াল চা। আর এর প্রতিটি টি ব্যাগে রয়েছে ২৮০টি ছোট্ট ছোট্ট হিরের টুকরা। সেই হিরের টুকরা আবার সাধারণ হিরের টুকরা নয়। এর কারুকার্য করেছে বিখ্যাত হিরের কোম্পানি বুডলেস জুয়েলার্স। অবশ্য চায়ের এই সংস্করণটি কেবল একবারই বের হয়েছিল। ২০০৫ সালে, কোম্পানিটির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। এই চায়ের ব্যাগ বিক্রির টাকার একটি অংশ খরচ হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য তহবিল গঠনে।

এই চা-ও চীনের উয়ি পাহাড়েই প্রথম পাওয়া যায়। গাছের হলুদ কুঁড়ি সংগ্রহ করার পর ৬০ শতাংশ জারণ করে সংরক্ষণ করা হয়। স্তরে স্তরে এই চায়ের স্বাদ বদলায়। আর চা যত পুরোনো হয়, ততই এর স্বাদ বাড়ে, সুপেয় হয়। দুই বছর পর পর তাপ দিয়ে এই চায়ের সঙ্গে কাঠ, ফুল আর

চকলেট ফ্লেভার দিয়ে পোড়ানো হয়। সাধারণত ৫০ বছর পর বিক্রির জন্য বের করা হয়। প্রতি কেজি চায়ের দাম ৫ লাখ টাকা।

কাঠ, ফুল আর চকলেট ফ্লেভার দিয়ে পোড়ানো এই চায়ের দাম প্রতি কেজি ৫ লাখ টাকা
কাঠ, ফুল আর চকলেট ফ্লেভার দিয়ে পোড়ানো এই চায়ের দাম প্রতি কেজি ৫ লাখ টাকা ছবি: পেকজেলস ডট কম থেকে
সোনার চা খেয়েছেন কখনো?

অবশ্য সরাসরি সোনার নয়, সোনার প্রলেপ দেওয়া। ঘটনা হলো, এই চা–গাছে যখন নতুন কুঁড়ি গজায়, তখন পুরো পাতায় ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই ইয়েলো গোল্ড-টি বাডস বছরের একটি বিশেষ দিনেই সংগ্রহ করা হয়। এই চায়ের কুঁড়ি সংগ্রহ করতেও ব্যবহার করা হয় স্বর্ণের কাঁচি। সাতবার প্রক্রিয়াজাত করার পর বাজারজাত করা হয় দুর্লভ প্রজাতির এই চা। এটিও চীনা চা।

আরেক পদের চা হলো ব্রোকেন লিফ টি। ইউরোপের এই চায়ের বিশেষত্ব হলো চা–গাছের কেবল তিন নম্বর পাতা দিয়েই এই চা হয়। নাম ব্রোকেন লিফ টি হওয়ার কারণ, ইউরোপের এক চা ব্যবসায়ী চীনে এই বিশেষ চা রপ্তানি করতে গিয়ে বুঝতে পারেন, চায়ের পাতা যদি আস্ত না রপ্তানি করে ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে জাহাজে দেড় গুণ চা বেশি ধরে। তখন থেকেই চা–পাতা ভেঙে রপ্তানি করার প্রচলন শুরু হলো। এক কেজি ব্রোকেন লিফ টির দাম ৩৫ হাজার টাকা।

তিয়েগুয়ানিন চা স্বাদে গ্রিন-টির চেয়ে কড়া। এতে ব্ল্যাক টির চেয়ে কম ক্যাফেইন থাকে। এই চা প্রস্তুত করতে হয় একটু সাবধানে। পুরোপুরি ফার্মেন্টেশন করা হয় না। রং বদলানো শুরুর আগেই বন্ধ করে দিতে হয় ফারমেন্ট করা। এই চা খেতে দারুণ। আবার মেদ ঝরাতেও বেশ কার্যকর। তিয়েগুনানিন চা হয় দুই রকম। ৬০ ঘণ্টা ঠান্ডায় রেখে দেওয়া হয়। এতে ঘ্রাণ হালকা আর সুগন্ধী হয়। অথবা ৬০ ঘণ্টা উচ্চ তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হয়। সেখানে এটি কালো হয়ে আসে। এটা বেশ কড়া আর ধোঁয়াটে স্বাদের হয়।

প্রতিবছর দামের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ে ভারতের আসামের মনোহরি গোল্ড টি। এ বছর প্রতি কেজি চায়ের দাম ধরা হয়েছে এক লাখ রুপি বা ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা। গত বছর এই চায়ের দাম ছিল ৭৫ হাজার রুপি। এই চা তৈরির সময় যখন বলক ওঠে, তখন সোনালি আভা ফুটে ওঠে। তা থেকেই এই নামকরণ। এই ভ্যারাইটির চা কেবল মনোহরি টি এস্টেটেই

উৎপাদিত হয়। এই চা নিজের বিশেষ সুগন্ধের জন্যও প্রসিদ্ধ। অন্যান্য চায়ের তুলনায় এই চায়ে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি। বার্ধক্য আর স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে এই চায়ের বিশেষ নামডাক আছে। ভোর চারটা থেকে ছয়টার ভেতর যখন প্রথম সূর্যরশ্মি পাতার ওপর পড়ে, তখন এই চা সংগ্রহ করা হয়। ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় রং বদলানো হয়। শুকানোর পর সোনালি রঙের দেখায়।

শীতের ঠাণ্ডাও যেভাবে শরীরের জন্য উপকারী

শীতকালে আমাদের শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। বছরের এই সময়ে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শরীরে নানাবিধ জীবাণুর আক্রমণ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডার উপদ্রোপ তো আছেই। এ কথাও ঠিক যে, শীতের ঠাণ্ডা আমাদের শরীরের উপকারেও লাগে।

যেমন-

ঘুমের ঘাটতি দূর করে: কাজের চাপ হোক কী স্ট্রেস, নানা কারণে আজকের যুব সমাজের চোখে একেবারেই ঘুম নেই। ফলে শরীর এবং মস্তিষ্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে রেস্ট না পাওয়ার কারণে বাড়ছে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। শীতের ঠাণ্ডা কীভাবে শরীরের জন্য উপকারী সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন হারবাল গবেষক ও চিকিৎসক ডা. আলমগীর মতি। ঠাণ্ডার কারণে শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। ফলে ঘুম আসতে সময় লাগে না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে ঘুমানোর সময় ঘরের তাপমাত্রা যদি ১৫.৫-১৯ ডিগ্রির মধ্যে থাকে, তাহলে সব থেকে ভালো ঘুম হয়।

ক্ষিদে বাড়ে: শীতকালে আমাদের ক্ষিদে বেড়ে যায়। ফলে ভালো-মন্দ খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়। ফলে ভিতর থেকে শরীর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে রোগভোগের আশঙ্কাও হ্রাস পায়। ওজন হ্রাস পায়: অতিরিক্ত ওজনের কারণে যদি চিন্তায় থাকেন, তাহলে সেই চিন্তা দূর হওয়ার সময় এসে

গেছে। ঠাণ্ডার সময় শরীর প্রতি মুহূর্তে নিজেকে গরম রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই কাজটা শরীর করে থাকে চর্বি গলানোর মধ্যে দিয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ বার্ন হতে শুরু করায় ওজন কমতে শুরু করে। শীতকালে আমাদের শরীরে জমতে থাকা খারাপ ফ্যাট বা ব্রাউন ফ্যাট গলতে শুরু করে। ফলে ওজন কমতে একেবারেই সময় লাগে না।

শীতকালে আরেকভাবে ওজন কমে থাকে। পৃথক এক গবেষণায় দেখা গেছে ঠাণ্ডার সময় আমাদের কাঁপুনি হয়েই থাকে। এমনটা হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে চর্বি ঝরতে শুরু করে। প্রায় ১ ঘণ্টা শরীরচর্চা করলে যে পরিমাণ চর্বি ঝরে, সেই একই পরিমাণ ঝরে প্রায় ১৫ মিনিট কাঁপুনি হলেও।

শরীরের প্রদাহ কমে: ঠাণ্ডার মৌসুমে শরীরের ভিতরে প্রদাহ বা ইনফ্লেমশন কমতে থাকে। ফলে যে কোনো ধরনের যন্ত্রণা কমতে একেবারেই সময় লাগে না। শীতকালে যেমন ব্যথা লাগার আশঙ্কা বাড়ে, তেমনি যন্ত্রণাও কমে খুব তাড়াতাড়ি।

মানসিক অবসাদ দূর হয়: ঠাণ্ডার সময় আমরা সহজে বাড়ি থেকে বেরতে চাই না। অনেকটা সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ মেলে। স্বাভাবিকভাবেই স্ট্রেস কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ব্রেন পাওয়ারও বৃদ্ধি পায়।

মশাবাহীত রোগের প্রকোপ কমে: ঠাণ্ডায় মশারা এত মাত্রায় কাবু হয়ে পড়ে যে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: আমাদের অনেকের মনে হয় যে শীতকাল মানেই আমাদের ত্বকের বারোটা বেজে যাওয়া। বাস্তবে কিন্তু ঠাণ্ডার সময় ত্বকের নানাভাবে উপকার হয়।

শীতকালে ত্বকের ভিতরে থাকা শিরা-ধমনীতে রক্তের সরবরাহ বেড়ে যায়। ফলে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই স্কিনের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে শুরু করে। ত্বকের আর্দ্রতা হারানো ছাড়া আর কোনো স্কিনের সমস্যা কিন্তু শীতকালে হয় না!

এনাল ফিশার হলে কী করবেন?

মলদ্বারের ব্যথায় অনেকেই ভুগে থাকেন। ফিশার মানে মলদ্বারে ঘা অথবা ফেটে যাওয়া। এটি দুই ধরনের হয়। তীব্র (একিউট) ফিশার হলে রোগীর মলদ্বারে অসম্ভব ব্যথা হয়। দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) ফিশারে ব্যথার তারতম্য হয়। এটি যে কোনো বয়সে হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক।

এনাল ফিশার হওয়ার জন্য দায়ী সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা মলত্যাগের সময় কোত দেয়া। এ ছাড়া শক্ত মল বের হওয়ার সময় মলদ্বার ফেটে যায় বলে মনে করা হয়। যারা আঁশযুক্ত খাবার খান তাদের এ সমস্যাটি কম হয় বলে মনে করা হয়। আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে রয়েছে শাকসবজি, কাঁচা ফলমূল, আলু, ছোলা, ইসবগুলের ভূসি ইত্যাদি।

চা-কফি বা মদ খাওয়ার সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। ঘন ঘন মলত্যাগ বা ডায়রিয়া হলে ফিশার হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা মলদ্বারের ভেতরের চাপ মেপে দেখেছেন। ফিশারে চাপ তেমন একটা বাড়ে না যদিও আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করলে মলদ্বার অতিরিক্ত সংকুচিত বলে মনে হয়।

উপসর্গ: মলদ্বারে ফিশারের প্রধান লক্ষণ ব্যথা ও রক্তক্ষরণ। এ ধরনের ব্যথা সাধারণত মলত্যাগের অব্যবহিত পরে হয় এবং কয়েক মিনিট থেকে বহু ঘণ্টা ধরে ব্যথা চলতে পারে। ‘প্রকটালজিয়া ফুগাক্স’ নামক এক ধরনের রোগেও মলদ্বারে ব্যথা হয়, কিন্তু সে ব্যথা মলত্যাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

রক্তজমাট বাধা পাইলসেও ব্যথা হয়, কিন্তু তখন রোগী মলদ্বারে চাকা আছে বলে অভিযোগ করে। এই রোগে রক্তক্ষরণের পরিমাণ সাধারণত কম। কারও কারও অতিরিক্ত রক্ত যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) এনাল ফিশারের রোগী একটু ভিন্ন ধরনের উপসর্গের কথা বলে। তারা কখনও কখনও তাদের মলদ্বারে অতিরিক্ত মাংসপিণ্ড, পুঁজ পড়া, চুলকানি অথবা এসব একত্রে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

এ ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। ব্যথা সাধারণত তীব্র হয় না অথবা অনেক সময় ব্যথা থাকেই না। ফিশারের রোগীরা অনেক সময় প্রস্রাবের সমস্যায় ভোগেন এবং মহিলারা কখনও

কখনও শারীরিক মিলনে বেদনা অনুভব করেন; যদিও রোগীরা বুঝতে পারেন কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণেই এমন হয়েছে তবুও যখন ব্যথা শুরু হয় তখন রোগী ভয়ে টয়লেটে যেতে চান না এবং মলত্যাগের বেগ হলে তাতে ব্যথার ভয়ে সাড়া দিতে চান না।

তীব্র ব্যথা সম্পন্ন ঘা (একিউট ফিশার): এ সময় মলদ্বার পরীক্ষা করলে দেখা যায় সেটা খুবই সঙ্কুচিত অবস্থায় আছে। তীব্র ব্যথার কারণে মলদ্বারের ভেতরের ঘা-টি দেখা দুঃসাধ্য। কোনো যন্ত্রও প্রবেশ করানো যায় না। অবশ্য সরু যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা সম্পন্ন ঘা (ক্রনিক ফিশার) : এ ক্ষেত্রে একটি মাংসপিণ্ড বা ‘গেজ’ দেখা যায়। মলদ্বারের ভেতরেও একটি মাংসপিণ্ড (ঐুঢ়বৎঃৎড়ঢ়যরবফ ধহধষ ঢ়ধঢ়রষষধ) দেখা যেতে পারে যাকে অনেকে টিউমার বলে ভুল করে। এ ক্ষেত্রে পায়ুপথের ভেতর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত যাতে টিউমার বা প্রদাহজনিত কারণ চিহ্নিত করা যায়। এ ফিশার সংক্রমিত হয়ে কখনও কখনও ফোঁড়া দেখা দিতে পারে এবং তা থেকে ফিস্টুলা (ভগন্দর) হয়ে পুঁজ পড়তে পারে।

প্রতিরোধ : কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করা উচিত এবং বেশি শক্তি প্রয়োগ করে মলত্যাগ করা উচিত নয়। বারে বারে মলত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করা এবং ডায়রিয়ায় দ্রুত চিকিৎসা করা উচিত।

চিকিৎসা : একিউট ফিশার শুরুর অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসা শুরু হলে বিনা অপারেশনে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। সিজ বাথ নিলে উপকার হয়। এটির নিয়ম হচ্ছে আধ গামলা লবণ মিশ্রিত হালকা গরম পানির মধ্যে নিতন্ব ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়। স্থানিক অবশকারী মলম ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। এতে যদি পুরোপুরি না সারে এবং রোগটি যদি বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে অপারেশন ছাড়া ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

সার্জিক্যাল চিকিৎসা : মলদ্বারের মাংসপেশির সম্প্রসারণ করা (এনাল ডাইলেটেশন)-এ পদ্ধতিটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য বেশির ভাগ সার্জন এটির বিপক্ষে। এ পদ্ধতির জন্য কোনো কোনো রোগীর মল আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে।

মলদ্বারের স্ফিংটারে অপারেশন : এই অপারেশনে মলদ্বারের অভ্যন্তরীণ স্ফিংটার মাংশপেশিতে একটি সূক্ষ্ম অপারেশন করতে হয়। অজ্ঞান করার প্রয়োজন নেই। দুই দিনের মধ্যেই রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।

অপারেশনের তিনদিন পর স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন।

গর্ভাবস্থায় মুখের রোগে অবহেলা করলে যে বিপদ

মুখের রোগ আমরা অনেক সময়ই গুরুত্ব দিই না। জিহ্বা, দাঁত, মাড়িতে নানান সমস্যা দেখা দেয়। ভিটামিনের ঘাটতি, দাঁত ও জিহ্বার যত্ন সঠিকভাবে না নিলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মুখের রোগ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। নতুবা বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. ফারুক হোসেন।

আপনি যদি গর্ভবতী হয়ে থাকেন এবং মাড়ি রোগ থাকে, সে ক্ষেত্রে আপনার শিশু নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম নিতে পারে। শুধু তাই নয়, এই শিশু আকার আকৃতিতে স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট হবে।

অন্তঃসত্ত্বা নারীর মাড়ি রোগে যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে। মাড়ি রোগের মাধ্যমে যদি ব্যাকটেরিয়া ‘ভিরিড্যান্স স্ট্রেপটোকক্কাই’ রক্ত প্রবাহে সংক্রমিত হয় তাহলে হার্টের ভাল্ব নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

হৃদরোগ ইতিমধ্যেই শীর্ষ ঘাতক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যা মাড়ি রোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মাড়ি রোগের ব্যাকটেরিয়া ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার বা টিউমারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই গর্ভাবস্থায় মাড়ি রোগ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে।

শুষ্ক মুখ এবং জিহ্বার কারণে মুখের লালার প্রবাহ কমে যায়, ফলে খাদ্যদ্রব্য ঠিকভাবে দ্রবন হয় না। দাঁতে ক্ষয় হয়ে থাকে। স্ট্রেপটোকক্কাস মিউট্যান্স এবং ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া দাঁতের ক্ষয় করে থাকে।

দাঁত শিরশির করলে আমরা ঠাণ্ডা খাবার খাই না। বিশেষ করে আইসক্রিম

বা বরফ জাতীয় কিছু। বরফ কখনও চুষবেন না এবং কামড়াবেন না। বরফ চোষা বা কামড়ানো দাঁতের ক্ষতি স্থায়ী করতে পারে, দাঁতের এনামেলে ছোট ছোট ক্র্যাক বা ফাটল সৃষ্টির মাধ্যমে। এই ক্র্যাক বা ফাটল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয় এবং সবশেষে পুরো দাঁতটিতে ফ্যাক্চার বা ফাটল সৃষ্টি হয়।

আপনার জিহ্বার রঙ কমলার রঙের মতো হতে পারে যদি ঠিকভাবে মুখ ও জিহ্বার যত্ন না নেওয়া হয়। যেমন জিহ্বা যদি নিয়মিত ব্রাশ বা পরিষ্কার করা না হয়। ভিটামিন ‘বি’ এবং ফলিক এসিডের অভাবে জিহ্বা লাল অথবা কমলা রং হতে পারে। অধিকাংশ সময় হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস সুপ্ত অবস্থায় নার্ভ সেলে থাকে। তাই এ ভাইরাসের সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

হাইপারথাইরয়ডিজমের রোগীরা মুখে জ্বালাপোড়া এবং অস্বস্তির কথা বলে থাকেন বিশেষ করে জিহ্বার ওপর এবং গালের অভ্যন্তর ভাগে। চিকিৎসা না হলে মুখের জ্বালাপোড়া এবং অস্বস্তিভাব একটি লম্বা সময়ব্যাপী থাকতে পারে। সাইকোসোমাটিক ব্যথাও মুখে একটি লম্বা সময় ধরে থাকতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রোগী রাতের বেলা ঠিকভাবে ঘুমাতে পারে না।

রোগী কখনও কখনও অস্থিরতা ও মানসিক চাপে ভুগে থাকেন। রোগীদের উচিত মুখস্ত ওষুধ সেবন না করে চিকিৎসকের কাছে সবকিছু খুলে বলা। তবেই একটি সমাধান বের হয়ে আসবে।

শীতের ‘স্ট্রিট ওয়্যার’ নিয়ে ফ্যাশন শো

ফ্যাশন ব্র্যান্ড রাইজ তাদের যমুনা ফিউচার পার্কের শোরুমের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিন্ন ধরনের এক জমকালো ফ্যাশন শোর আয়োজন করে শুক্রবার। যেহেতু তারা মূলত স্ট্রিট ফ্যাশন নিয়ে কাজ করে, তাই যমুনা ফিউচার পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাশন শোটির কেন্দ্রেও ছিল স্ট্রিট ফ্যাশন।

‘অল মাস্কড আপ: স্ট্রিট ওয়্যার’ নামের শোটির পরিকল্পনা করেন প্রতিষ্ঠানের সিইও ফাহিম মোশাররফ। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করেন তানজিলা তানভীন ও তাঁর দল। শোর কোরিওগ্রাফি করেন আজরা মাহমুদ।

এ সময় মঞ্চে আসেন কয়েকজন তারকা। ছিলেন মডেল আজিম–উদ্–দৌলা। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত চলে এই ফ্যাশন শো। এখানে চলতি শীতের নতুন কালেকশনগুলো পরে র্যাম্পে হাঁটেন মডেলরা।

রাইজ ব্র্যান্ডের সিইও ফাহিম মোশাররফ বলেন, ‘একটি পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের গল্প বলে। পোশাকের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকে তারুণ্যের সেসব গল্প আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরি। ঢাকা শিগগিরই একটি ফ্যাশন হাব (ফ্যাশন দুনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, যেমন ফ্রান্সের প্যারিস, ইতালির মিলান) হতে চলেছে। আমরা দেশের মানুষের পোশাকের প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়মিত বিদেশেও রপ্তানি করছি। বাংলাদেশে ঐতিহ্যকে ধারণ করে পোশাকের ব্র্যান্ড রাইজ পোশাক ডিজাইন করে।’

যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজিত এই ফ্যাশন শোতে উপস্থিত ছিলেন নগদের চিফ পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার সোলাইমান সুখন, প্রতিষ্ঠানটির সিইও ফাহিম মোশাররফ, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ সাব্বির আফনানসহ ব্র্যান্ডটির কর্মকর্তারা। আরও ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি আর সাধারণ দর্শক।

২০১৪ সালে রাইজ কাজ শুরু করে। ২০১৭ সালে প্রথম শোরুম প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্র্যান্ডের ফেসবুক পেজে সাড়ে পাঁচ লাখ ফলোয়ার রয়েছে।

শীতে যে চার বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি

টের পাওয়া যাচ্ছে শীতকাল এসে গিয়েছে। একটু একটু করে হিমেল চাদরে তাই মুড়ে যাচ্ছে পৃথিবী। সেই সঙ্গে দফা-রফা হচ্ছে অনেক কিছুর। খুচখাচ সর্দি-কাশি বারোটা বাজাচ্ছে স্বাস্থ্যের। সে না হয় সামলে

নেওয়া যায়, দিনদুয়েক ওষুধ খেলেই!

কিন্তু তার পর? সর্দি-কাশি সেরে যাওয়ার পরেও এমন বেশ কয়েকটা ব্যাপার রয়েছে যার দিকে নজর না দিলে এই শীতে পস্তাতে হতে পারে। কীরকম?

পানি জীবন:
ছোট থেকে পাঠ্যবইতে পড়তে পড়তে কথাটা বেশ একঘেয়ে হয়ে এসেছে। কিন্তু শীত এলেই কথাটা কতটা সত্যি, তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। আসলে হয় কী, শীতে আবহাওয়া শুকনো হয়ে থাকে বলে তার প্রভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে আমাদের শরীরও। শুধু ত্বকেই ভাঁজ পড়ে না, পাশাপাশি শরীর ভিতর থেকেও শুকিয়ে যায়। তাই শীতে ভালো থাকতে হলে ভিতরে-বাইরে, জল ছাড়া গতি নেই! তেষ্টা না পেলেও দিনে লিটার দুয়েক জল আপনাকে খেতেই হবে! অন্যথায় অসুস্থতা ছাড়া আর কিছু পাওনা হবে না!

রূপটান:
শীতের ক্ষতিকর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ত্বকের উপরে। একেবারে হাতেনাতে বোঝা যায়, কতটা দুর্দশা হয়েছে ত্বকের। ফলে এই সময় ত্বক এমনিতেই খুব সংবেদনশীল একটা পর্যায়ে থাকে। তাতে হয় কী, সামান্য অনিয়মেও ব়্যাশ, অ্যালার্জি দেখা দেয়। তাই এই শীতে মেকাপ, ক্রিম-এসব রূপটানের জিনিস খুব সাবধানে বাছুন! কম দামি কিছু ব্যবহার না করাই ভালো! কেন না, পারদ-যুক্ত কম দামের প্রসাধনী শুধু শীতে কেন, বছরের যে কোনও সময় ত্বকের বারোটা বাজাবার পক্ষে আদর্শ। শীতে ক্ষতিটা একটু তাড়াতাড়ি হয়, এই যা! পাশাপাশি, খুব হালকা ঘরোয়া কোনো ফেস-প্যাক ব্যবহার করতে পারেন ত্বককে কোমল রাখার জন্য।

তেলে ত্বক তাজা:
এই যে বলছি- শীতে ত্বকের ক্ষতি হয়, সে তো জানা কথাই! কিন্তু ক্ষতিটা ঠিক কীভাবে হয় বলুন তো? আসলে এই সময় ত্বকের অ্যাসিড লেভেল কমে যায়। ফলে, ত্বক তার আর্দ্রতা হারায়। খুব তাড়াতাড়ি শুকনো, অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। ত্বককে তাই শীতে তরতাজা রাখার একমাত্র উপায় তেলের আদরে রাখা। রোজ স্নানের আগে নিয়ম করে তেল মাখুন! দেখবেন, রুক্ষ শীতেও ত্বক দিব্যি চকচকে থাকছে!

পায়ে পায়ে:
শীতে পা নিয়ে ভোগেন না- এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুর্লভ! কিছু না

কিছু একটা সমস্যায় পা-কে ফেলেই শীত ঋতু। হয় দুর্গন্ধের সমস্যা, নয় ফাটা গোড়ালির সমস্যা। এর হাত থেকে বাঁচতে পা পরিষ্কার রাখুন। রোজ বাইরে থেকে এসে ভালো করে সাবান দিয়ে ঘষে পা পরিষ্কার রাখুন। তাতে শুকনো, মরা কোষ বেরিয়ে যাবে, পায়ে দুর্গন্ধ হবে না।

এছাড়া শীতে পা ফাটার হাত থেকে বাঁচতে বাড়িতেও খালি পায়ে থাকা বন্ধ করুন। তাতে পায়ে সরাসরি ঠাণ্ডা লাগবে না। এছাড়া ঘুমোতে যাওয়ার আগে পায়ের পাতায়, গোড়ালিতে কোনো ক্রিম ম্যাসাজ করুন। সবার শেষে মোজা পরে নিন। তাতে ক্রিমের আস্তরণের উপরে ধুলো-বালি জমে পায়ের ক্ষতি করতে পারবে না!

রাতের যে খাবারগুলোয় ওজন বাড়বে না

কখনো কি ভেবে দেখেছেন, দিনের চেয়ে রাতে কেন খাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে যায়? বিশেষ করে গভীর রাতে স্ন্যাকস জাতীয় খাবার খাওয়ার ইচ্ছা থাকে প্রবল। রাত যত গভীর হয়, পেটপুরে খাওয়ার পরও ততই শেষ রাতে খাওয়ার জন্য মন কেমন করে। একেই বলে ‘লেট নাইট ক্রেভিং’। যদিও এর কারণ বের করা খুব কঠিন নয়। খিদের চেয়ে মানসিক তৃপ্তিই এর প্রধান কারণ। কিন্তু রাতের খাবারে ওজন বাড়ে। কেননা যেটুকুই খাওয়া হয়, সেটুকুই জমে যায়। সেই ক্যালরিটা তো আর খরচ হয় না। বিশেষ করে গভীর রাতের খাবারে তো তরতর করে ওজন বাড়বে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ‘লেট নাইট ক্রেভিং’ মেটানোর জন্য আছে আলাদা ধরনের কিছু খাবার। যাতে ওজন বাড়বে না, আবার পেটেও মিলবে সান্ত্বনা।
সিনেমা দেখতে দেখতে শেষ রাতে হঠাৎ কুড়মুড়ে খাবার খাওয়ার ইচ্ছা হলে কী করেন? নিশ্চয়ই চিপসের প্যাকেট নিয়ে বসে যান। ভুলটা করছেন এখানেই। কারণ, প্যাকেটের চিপসে থাকে প্রচুর লবণ। আর এতে ওজন বাড়ে দ্রুত। তাহলে উপায়? একেবারে লবণ ছাড়া বেক করা চিপস হতে পারে লেট নাইট ক্রেভিংয়ের উপযুক্ত দাওয়াই।

শেষ রাতের খাবার হিসেবে আইসক্রিমের বিশেষ জনপ্রিয়তা আছে। শুধু

‘লেট নাইট ক্রেভিংয়ের ক্ষেত্রেই নয়, বরং মন খারাপ বা ভালো থাকলেও আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করে। তবে আপনি কি ‘নাইসক্রিমে’র নাম শুনেছেন? এটি আপনাকে আইসক্রিমের স্বাদই দেবে। কিন্তু ওজন বাড়াবে না। বরফ করা স্ট্রবেরি, ভ্যানিলা নির্যাস, সামান্য প্রাকৃতিক মিষ্টি এবং ফ্যাট ছাড়া দুধ দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যাবে ‘নাইসক্রিম’।

পপকর্ন পছন্দ হলেও ওজন বাড়ার ভয়ে অনেকেই থাকেন দূরে। কিন্তু ভিন্ন উপায়ে তেল, মসলা ছাড়াও পপকর্ন তৈরি করা যায়। ‘লো কার্ব’ পপকর্নও আছে বাজারে। এ ধরনের পপকর্ন আপনি চাইলে ঘরেও তৈরি করতে পারেন। আবার কিনেও খেতে পারেন।

ফল শুকিয়ে নিলে তাতে চিনির পরিমাণ অনেক কমে যায়। আর এটি নাইট ক্রেভিং খাবার হিসেবেও মজাদার। পাতলা করে কাটা আপেল, বেরি, কিশমিশ বা পিচ ফলের টুকরা মজাদার ড্রাই ফ্রুট। বাজারে কৌটাভর্তি নানান পদের শুকনা ফলের মিশ্রণ কিনতে পাওয়া যায়। অল্প খেলেই পেট খুশি থাকবে। আবার ক্যালরিও বাড়বে না বিশেষ।

শুকনো ফল খেতে ‘পানসে’ লাগলে ওপরে ছড়িয়ে দিতে পারেন ডার্ক চকলেট। আর কিছু বাদাম। আর রাতে খাওয়ার ফল হিসেবে বেছে নিতে পারেন আপেল। কথায় বলে ‘অ্যান আপেল আ ডে, কিপস দ্য ডক্টর অ্যাওয়ে।’ এর মানে দাঁড়াল, প্রতিদিন একটা করে আপেল খেলে আপনার আর চিকিৎসকের কাছে দৌড়াতে হবে না। সেই আপেলটি আপনি মধ্যরাতে খেতে পারেন। এর আরেকটা সুবিধা হলো, আপেল খাওয়ার পর আর কিছু না খেলে রাতে ব্রাশ করার প্রয়োজন কমে যায়।

স্যান্ডউইচ দ্রুত ওজন বাড়াতে পারে। কেননা, সাধারণত আমরা যা কিছু দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাই, সেগুলো উচ্চমাত্রার ক্যালরি, প্রোটিন ও ফ্যাট–সমৃদ্ধ। তাই শেষ রাতে খেতে হবে এমন স্যান্ডউইচ যা ‘খাই খাই’ ভাবটাও কমাবে, আবার ওজনও রাখবে ঠিক জায়গায়। সেজন্য কলার সঙ্গে আলমন্ড বাটার মিলিয়ে পেস্ট তৈরি করে তা পাউরুটির টুকরার ওপর মাখিয়ে দুটি শসা আর লেটুস পাতা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন স্যান্ডউইচ।